দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বাংলা একাডেমীর অমর একুশে উদ্‌যাপন

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

একুশে ফেব্রুয়ারি একটি চেতনার নাম। একুশের চেতনা আমাদের জ্ঞানের, মননের, সৃজনশীলতার দিগন্তকে সম্প্রসারিত করেছে, সৃষ্টিশীলতাকে করেছে উজ্জীবিত এবং আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে করেছে বিস্তৃত। এই চেতনা আমাদের জীবনে নতুন আবেগ সঞ্চার করেছে, আমাদের জীবনকে দিয়েছে পূর্ণতা। এই চেতনা আমাদেরকে বারবার অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতনের প্রতিবাদে সোচ্চার ও সক্রিয় হতে শিখিয়েছে। আমাদের জীবনে একুশের কোনো মৃত্যু নেই। আমরা এই চেতনার পথ ধরেই পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা।

একুশের চেতনা কেবল সভা-মিছিল আর গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে এই চেতনার ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলা একাডেমী প্রতি বছর অমর একুশে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শহীদ মিনার যেমন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একই মঞ্চে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে, বাংলা একাডেমীও তেমনি হয়ে উঠেছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের তীর্থস্থান। প্রতিবছর অমর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা বাংলা একাডেমীর অমর একুশে উদ্‌যাপনকে দান করে বহুমাত্রিকতা।

যুক্তিসম্মত বিবেচনা, সহিষ্ণুতা, সংযম, সৌজন্য, বিচারবোধ ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার বিকাশে বাংলা একাডেমীর অমর একুশে উদ্‌যাপন বিশেষ এক ভূমিকা পালন করে। ভাষা আন্দোলনের ফসল বাংলা একাডেমী অমর একুশে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে একুশের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সদা তৎপর। তাই বাংলা একাডেমী হয়ে উঠেছে জাতির মননের প্রতীক।

বিশ্বের ইতিহাসে এমন কোনো দৃষ্টান্ত সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে মাতৃভাষার জন্য কোনো দেশের ছাত্র-জনতা আত্মাহুতি দিয়েছেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা আমাদের মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যেভাবে আত্মাহুতি দিয়েছেন, সেই আত্মত্যাগের তাৎপর্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে যেমন গভীর প্রেরণার উৎস তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও এটি হয়ে থাকবে আত্ম-ত্যাগের এক মহৎ দৃষ্টান্ত। বাংলা একাডেমী প্রায় চার দশক ধরে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমী ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর একদিন অর্থাৎ অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আলোচনা-সভা, আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে অমর একুশে উদ্‌যাপন করে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রতিবছর সপ্তাহব্যাপী প্রবন্ধ-পাঠ, আলোচনা, আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, প্রদর্শনী ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অমর একুশে উদ্‌যাপন করে। ১৯৮৩ সালে তৎকালীন সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কারণে সপ্তাহব্যাপী অমর একুশে উদ্‌যাপনের নিয়মিত বা নির্ধারিত অনুষ্ঠান হয়নি। ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমী পক্ষ-কালব্যাপী অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের মাধ্যমে অমর একুশে উদ্‌যাপন করে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তিনসপ্তাহব্যাপী অমর একুশে উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৯২ এবং ১৯৯৩ সালে এই অনুষ্ঠান মাসব্যাপী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এবং এখনো তা অব্যাহত আছে।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে গঠিত বৃহত্তর বাংলা একাডেমীর কর্মকাণ্ড তারই একটি প্রামাণ্য নিদর্শন অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম দিককার বছরগুলোতে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ পরিলক্ষিত হয় তার প্রাথমিক অভিব্যক্তি 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এটি এখন গ্রন্থোৎসব। এ উৎসব এদেশে প্রথম আয়োজিত হয় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ১৯৭২-এ।

স্বাধীনতা লাভের কিয়ৎকালের মধ্যেই ১৯৭২ সাল থেকে বাংলা একাডেমী তার নিজস্ব প্রকাশনা একুশ উপলক্ষে হ্রাসকৃত মূল্যে প্রথম বই বিক্রি শুরু করে। ১৯৭৪ সালে একুশ উপলক্ষে একাডেমীতে জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে একাডেমীর বই বিক্রি ও প্রদর্শিত হয়।

১৯৭৫ সাল থেকে বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একাডেমীর গেটের পাশে বই বিক্রি করতে শুরু করে। পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে এইসব পুস্তক বিক্রেতার সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। ১৯৭৮ সালে এসে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ মেলায় রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ কারণেই এ বছর থেকে মেলাটিকে গ্রন্থমেলা হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। বাংলা একাডেমী এই মেলার আয়োজন করে।

পরের বছরে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি গ্রন্থমেলা আয়োজনে বাংলা একাডেমীর সহযোগী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৮৪ সালে এসে গ্রন্থমেলার জন্য বিধিবদ্ধ নীতিমালা প্রণীত হয় এবং এই গ্রন্থমেলার নাম হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। সেই থেকে অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রতি বছর প্রায় একই আঙ্গিকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিলো।

১৯৯২ সালে এসে মেলার পরিধি, আয়োজনের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য পুনরায় পরিবর্তিত হয়ে গেলো। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমীর পাশাপাশি মাত্র একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'মুক্তধারা' একুশের মেলায় বই বিক্রি করে, ১৯৮০ সালের গ্রন্থমেলায় সে সংখ্যা বেড়ে হয় ৩০। মাত্র পাঁচ বছর পর ১৯৮৫ সালে সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮২; এবং আর মাত্র ছয় বছর পর ১৯৯১ সালে এই সংখ্যাটি ১৯০তে (১৮০+১০) উন্নীত হয়।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭০-এর মতো এবং এককের হিসেবে স্টল সংখ্যা তিনশ পঞ্চাশের অধিক। তাই বাংলা একাডেমীর দেয়ালঘেরা স্বল্প-পরিসর প্রাঙ্গণে এই মেলা আর আবদ্ধ থাকলো না। একাডেমীর দেয়াল ভাঙা হলো, জনগণের জন্য প্রবেশদ্বার প্রসারিত হলো, আর মেলার একাংশ ছড়িয়ে পড়লো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসংলগ্ন রাস্তার দুপাশে। মিলন চত্বর থেকে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত চিহ্নিত হলো 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র প্রাঙ্গণরূপে।

সত্তর দশকের শেষ দিকে মেলার ব্যাপক আয়োজন শুরু হলেও এই আয়োজন পূর্ণতা পায় আশির দশকের মাঝামাঝিতে এসে। নব্বইয়ের শুরুতেই মেলা অভাবনীয় ব্যাপ্তি লাভ করে। তারই ফলস্বরূপ ১৯৯২ সাল থেকে মেলা-প্রাঙ্গণেরও বিস্তৃতি ঘটে। ১৯৯৩ এ মেলা প্রাঙ্গণ প্রকৃত অর্থেই দোয়েল চত্বর থেকে মিলন চত্বর পর্যন্ত পূর্ণ প্রসারিত হয়। '৯২ এর তুলনায় মেলায় অনুমোদিত স্টলের সংখ্যাও বাড়ে প্রায় শতাধিক।

১৯৯৩-এ মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩৮। ১৯৯৪ সালে ছিলো ৬৫৩, ১৯৯৫ সালে ৪৬৭, ১৯৯৬ সালে ৪৮৬, ১৯৯৭ সালে ৫২০।

এই অমর একুশে গ্রন্থমেলা আজ কেবল পুস্তকমেলা নয়। এটি লেখক-পাঠক-ক্রেতা-প্রকাশক ও সর্বসাধারণের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। এই মেলা এদেশের সাংস্কৃতিক জাগরণকে দিন দিন আরও সংহত ও শাণিত করে তুলছে।